কক্সবাজার উন্নয়ন বর্তিকা

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

সূচিপত্র

০১।	বাণী সমূহ-	০৪-০৮
০২।	সম্পাদকীয়-	০৯-১০
০৩।	কক্সবাজারের ইতিহাস-	১১
০৪।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইতিহাস, গঠনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলী-	১২-১৪
০৫।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা-	১৫
০৬।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ-	১৬-২০
০৭।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ-	২১-৩৮
০৮।	অতি শীঘ্রই বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ	৩৯-৪৪
০৯।	প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ	৪৫-৫১
১০।	বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কমিটি গঠন, কার্যক্রম, গণশুনানী ও মতবিনিময় সমূহ	৫২-৫৫
১১।	কক্সবাজারকে আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে কয়েকটি প্রস্তাবনা-	৫৬-৫৮
১২।	হাজারো স্বপ্ন এবং কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৫৯-৬১
১৩।	রূপময়ী দ্বীপের জেলা কক্সবাজার	৬২-৬৮
১৪।	প্রফেশনাল হয়ে উঠুন	৬৯
১৫।	পরিকল্পিত নগরায়নে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র এবং নকশা অনুমোদনের গুরুত্ব	৭০-৭১
১৬।	কক্সবাজার এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা	৭২-৭৫
১৭।	কউকের কার্যক্রম নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশেষ কিছু প্রতিবেদন	৭৬-৮২
১৮।	**ফটো গ্যালারী** কউক এর গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ/অর্জন সমূহ-	৮৩-১২০

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:
লে: কর্নেল (অব:) ফোরকান আহমদ, এনডিসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

সম্পাদক:
লে: কর্নেল মোহাম্মদ আনোয়ার উল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার্স
সদস্য (প্রকৌশল)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রকাশক:
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বিএমএ ভবন, কলাতলী রোড, কক্সবাজার
ফোন: ০৩৪১-৬২৭০০
ফ্যাক্স: ০৩৪১-৬২৭০২
ই-মেইল: info@coxda.gov.bd
ওয়েব: www.coxda.gov.bd

প্রকাশকাল:
মে-জুন ২০১৯

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
Frontline
ফ্রন্টলাইন কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
ই-মেইল: frontlinebd.2009@gmail.com
ওয়েব: www.frontlineltd.co

মুদ্রণ:
কালার ওয়েব গ্রাফিক প্রিন্টিং
৯৯/৩ পুরানা পল্টন লেন
ঢাকা-১০০০

কক্সবাজার এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা

মোঃ আব্দুর রকিব খান
সিনিয়র কনসালটেন্ট
(টাউন প্ল্যানার)
কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাচীন কক্সবাজারের ঐতিহ্য ও বিশ্ববিখ্যাত পর্যটন নগরীর ইতিহাস সূচনা হয় নবম শতাব্দী থেকে। ১৬১৬ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের অধিগ্রহণের আগ পর্যন্ত কক্সবাজারসহ চট্টগ্রামের একটি বড় অংশ আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মুঘল সম্রাট শাহ সুজা পাহাড়ী রাস্তা ধরে আরাকান যাওয়ার পথে কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং এখানেই তার সেনাবাহিনীকে ক্যাম্প স্থাপনের আদেশ দেন। তার যাত্রাবহরের প্রায় একহাজার পালকী ছিল যা কক্সবাজারের চকরিয়ার ডুলাহাজারা নামক স্থানে অবস্থান নেয়। ডুলাহাজারা অর্থ হাজার পালকী। মুঘলদের পরে ত্রিপুরা এবং আরাকান তার পর পর্তুগিজ এবং ব্রিটিশরা এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয়।

কক্সবাজার নামটি এসেছে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক অফিসারের নাম থেকে। একসময় কক্সবাজার পানোয়া নামেও পরিচিত ছিল যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে হলুদ ফুল। এর আরো একটি প্রাচীন নাম হচ্ছে পালঙ্কি। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধ্যাদেশ, ১৭৭৩ জারি হওয়ার পর ওয়ারেন্ট হেস্টিংস বাঙলার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তখন হিরাম কক্স পালংকির মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। কক্সবাজারে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চাষিদের মাঝে জমি বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে চট্টগ্রাম ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মানুষ এই এলাকায় আসতে শুরু করে। বার্মারাজ বোধাপায়ী ১৭৮৪ সালে আরাকান দখল করে নেয়। প্রায় ৩৩ হাজার আরাকানি বার্মারাজের হাত থেকে বাঁচার জন্য ১৭৯৯ সালে কক্সবাজার অবস্থান নেয়। ক্যাপ্টেন কক্স আরাকান শরণার্থী এবং স্থানীয় রাখাইনদের মধ্যে বিদ্যমান হাজার বছরেরও

পুরানো সংঘাত নিরসনের চেষ্টা এবং শরণার্থীদের পুণর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেন। কিন্তু কাজ পুরোপুরি শেষ করার আগেই ১৭৯৯ সালে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স মারা যান। তার পুনর্বাসন অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর নাম দেয়া হয় কক্স সাহেবের বাজার। এভাবেই কক্সবাজারের গোড়াপত্তন হয়েছিল। কক্সবাজার ছিল চট্টগ্রাম বিভাগের একটি মহকুমা। কক্সবাজারে থানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ সালে এবং পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৬৯ সালে। বর্তমানে কক্সবাজার বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র জেলাশহর যেখানে আধুনিক ও আকর্ষণীয় পরিকল্পিত পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠাকল্পে ২০১৬ সালে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে।

কক্সবাজার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পর্যটন শহর। কক্সবাজার তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় ১২০ কি: মি: দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট্য সমুদ্র সৈকতের বৃহদাংশই কক্সবাজারে বিস্তৃত। এ সমুদ্র সৈকতের বৈশিষ্ট্য হলো সমুদ্র সৈকতটি বালুকাময়, কাদার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বালিয়াড়ি সৈকত সংলগ্ন শামুক ঝিনুকসহ নানা প্রজাতির প্রবাল সমৃদ্ধ বিপণি বিতান, অত্যাধুনিক হোটেল মোটেল কটেজ, নিত্য নব সাজে সজ্জিত বার্মিজ মার্কেট সমূহে পর্যটকদের বিচরণে কক্সবাজার শহর পর্যটন মৌসুমে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা থাকে। সুইজারল্যান্ডের "New Seven Wonderers Foundation" নামীয় বার্নাড ওয়েবার এর ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০০০ সালে ২য় বারের মত বিশ্বের প্রাকৃতিক নতুন সপ্তাশ্চার্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতটি কয়েকবার শীর্ষ স্থানে ছিল। একই সাথে রয়েছে অপরূপ সৌন্দর্য্যের প্রাকৃতিক পাহাড় ও বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলে বন্য হাতি সহ বিভিন্ন জীব বৈচিত্র্যের সমারোহ। সমুদ্রের তীরের কোথাও কোথাও সামুদ্রিক কচ্ছপের অবাধ বিচরণ ও বংশ বিস্তারের অভয়ারণ্য। কক্সবাজার শহর থেকে বদর মোকাম পর্যন্ত একটানা ৯৫৫ কিলোমিটার (৯৬ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে রয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্য বন্দর এবং সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও রেল চলাচল শুরু হলে কক্সবাজারে পর্যটকের আনাগোনা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

সুইজারল্যান্ডের "New Seven Wonderers Foundation" নামীয় বার্নাড ওয়েবার এর ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০০০ সালে ২য় বারের মত বিশ্বের প্রাকৃতিক নতুন সপ্তাশ্চার্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতটি কয়েকবার শীর্ষ স্থানে ছিল।

কুতুবদিয়া কক্সবাজার জেলায় একটি মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপার সম্ভাবনাময় একটি দ্বীপ উপজেলা। 'কুতুবদিয়া দ্বীপ' বিখ্যাত বাতিঘরের কারণে এ প্রবাদটি ছোটবেলায় বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে লেখা ছিল। ইদানিং তেমনটি আর লেখা হয় না। কারণ বাতিঘরটি আর কুতুবদিয়াতে নেই। আছে শুধুমাত্র বাতিঘরটির ভগ্নস্তুপ এলাকা নিয়ে গঠিত বাতিঘরপাড়া। তৎকালিন সময়ে চাঁদ এন্ড ব্রাদার্স কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক মনোনীত স্থপতি নেয়ার বার্মিংহাম এর তত্ত্বাবধানে ১৮৪৬ সালের দিকে কুতুবদিয়ার দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের আলী ফকির ডেইল নামক স্থানে আটতলা তথা আটকক্ষ বিশিষ্ট বাতিঘরটি নির্মিত হয়। ১২০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট গোলাকৃতি আলোক স্তম্ভের প্রতিটি কক্ষে মূল্যবান কাঁচ খচিত জানালা ছিল। কক্ষের চারদিকে রেলিং ছিল। সর্বোচ্চ কক্ষে বাতিঘরটি প্রজ্জ্বলন করা হতো। ১৯ মাইল দূর থেকে নাবিকরা এ বাতিঘর থেকে আলো প্রত্যক্ষ করে দিক চিহ্নিত করতো। শঙ্খ নদীর তীব্র স্রোতের তোড়ে বাতিঘরটি ধ্বংস হতে থাকে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাতিঘরটি পুরোপুরি ধ্বংস হলে গভীর সমুদ্র চলাচলরত নাবিক ও মাঝিমাল্লাদের কথা মাথায় রেখে তদানিন্তন সরকার ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে একই এলাকায় অর্থাৎ এর দু'কিলোমিটার পূর্বে বাঁধের ভেতরে প্রায় সাত একর জমিতে আরো একটি বাতিঘর নির্মাণ করে। বাতিঘরের সাথে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য একটি গেস্ট হাউস ও দু'টি আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ২৯ এপ্রিল প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পুনঃ নির্মিত বাতিঘরটি সাগরে বিলীন হয়ে যায়। নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় মেয়াদোত্তীর্ণ এসব স্থাপনা জরাজীর্ণ অবস্থায় কালের নীরব সাক্ষী হিসেবে এখনো সাগরদ্বীপ কুতুবদিয়ায় অযত্নে, অবহেলায় বিদ্যমান রয়েছে। কুতুব আউলিয়ার উত্তরসূরি হযরত শাহ আবদুল মালেক আল কুতুবী (রাঃ) এর মাজার শরীফের অসংখ্য ভক্ত প্রায় প্রতিদিন কুতুবদিয়া সফর করে থাকেন। কুতুবদিয়া সফরের প্রাক্কালে ঐতিহাসিক বাতিঘরের অস্তিত্ব সন্ধানের জন্য পর্যটকদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে কক্সবাজার জেলার অপূর্ব সৌন্দর্যবেষ্টিত পর্যটন সম্ভাবনাময় মহেশখালী উপজেলার কুতুবজোম ইউনিয়নের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ সোনাদিয়া দ্বীপ। সোনাদিয়া দ্বীপের আয়তন ৪৯২৮ হেক্টর। সৃষ্টি শৈল্পিক আদলে গড়া কক্সবাজার জেলার পর্যটন শিল্পের আরেক সম্ভাবনাময় সৈকতের নাম সোনাদিয়া। এখানে রয়েছে বালিয়াড়ি, কাছিম প্রজনন ক্ষেত্র, চামচ ঠোঁটের বাটন পাখি এবং অতিথি পাখির অভয়ারণ্য। কোলাহল মুক্ত সৈকত, লাল কাঁকড়ার মিলন মেলা, বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কাছিম, পূর্ব পাড়ার হযরত মাবহা আউলিয়ার মাজার ও তার আদি ইতিহাস। জেলেদের সাগরের মাছ ধরার দৃশ্য, সূর্যাস্তের দৃশ্য, প্যারাবন বেষ্টিত

এ দ্বীপে আঁকা-বাঁকা পথে নৌকা ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা স্বত্ত্বেও সরকারী বা বেসরকারীভাবে যথাযথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনার অভাবে এ পর্যন্ত পর্যটন আকর্ষণের আধুনিক কোন পদক্ষেপ বলতে গেলে নেওয়া হয়নি। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক তা বাস্তবায়ন করা গেলে পর্যটন রাজধানী হিসাবে পরিচিত কক্সবাজার শহরের অতি নিকটবর্তী এ দ্বীপটি পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্যতম স্থান হতে পারে যা দেশের তথা কক্সবাজারের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি দ্বীপবাসীর জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই দ্বীপে দ্বীপবাসীর সম্পৃক্ততায় কমিউনিটিভিত্তিক ইকোট্যুরিজমের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যা দ্বীপবাসীর বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সোনাদিয়া দ্বীপের নামকরণের সঠিক কোন ঐতিহাসিক তথ্য না থাকলেও সোনাদিয়ার দ্বীপকে ঘিরে আদিকাল হতে সোনা সমতুল্য দামী পণ্য মৎস্য সম্পদ আহরিত হত বলে এই দ্বীপ সোনার দ্বীপ, সোনাদিয়া বলে পরিচিতি। তাই ঐতিহাসিক ভাবে না হলেও লোক মুখে উচ্চারিত সোনাদিয়ার কথা বিবর্তনে সোনাদিয়ায় রূপান্তরিত হয়। দ্বীপটি সোনাদিয়া হিসাবে বর্তমান প্রজন্মের কাছেও বই পুস্তকে স্থান পাচ্ছে। কালক্রমে মানুষ মহেশখালীর অপরাপর এলাকা সমূহে বসবাস শুরু করলেও আদিকালে পরিচিতি সূচনা হয় সোনাদিয়া ঘিরে। কারণ প্রাচীনকালে মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যমে ছিল নদী পথ, তদুপরি মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম ছিল মৎস্য শিকার। তাই, উভয় কারণে সোনাদিয়ার সাথে মানুষের পরিচয় ঘটে অনেক পূর্ব থেকে।

মহেশখালীতে মূলত ১৫৫৯ সালের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের পর হতে বসতি স্থাপন আরম্ভ হয়। তদপূর্বে মহেশখালী কক্সবাজারের সাথে যুক্ত ছিল বলে ইতিহাসে প্রতিপাদিত। কালক্রমে মহেশখালী চট্টগ্রাম এলাকা থেকে লোকজন এসে বসতি শুরু করে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে যারা মাছ শিকার পেশার সাথে পূর্ব হতে জড়িত ছিল এবং সোনাদিয়া সম্বন্ধে অবগত ছিল তারাই সোনাদিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিক উপযুক্ত মনে করত। সোনাদিয়ার প্রাচীন পরিবার হচ্ছে "ফৌজনীর পরিবার"। ব্যক্তি বিশেষে ছাদের আলী, আশরাফ মিয়া ও আছাদ আলী এদের পরিবার সোনাদিয়ার ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবার বলা চলে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এই দ্বীপে অনেক দিন অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে ঐ পরিবারের শেখ মুজিবের পক্ষ হতে প্রাপ্ত অবদানের কথা শোনা যায়। বিশেষ করে শীত মৌসুমে শুকানো বিভিন্ন প্রজাতির শুটকি মাছ ভোজন রসিকদের রসনা বিলাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই কক্সবাজারে পর্যটনে আসা কোন পর্যটক সোনাদিয়ার শুটকি ছাড়া ঘরে ফিরতে চায় না। সোনাদিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। এখানে রয়েছে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মসজিদ রয়েছে ২টি। সাদা বাইন, কালো বাইন, কেওড়া, হরগোজা, নোনিয়াসহ প্রায় ত্রিশ প্রজাতির প্যারা সমৃদ্ধ উদ্ভিদ বিদ্যমান। মোহনা, চর ও বনভূমিতে উনিশ প্রজাতির ছিংড়ি, চৌদ্দ প্রজাতির শামুক ঝিনুক ও নানা ধরনের কাকড়া। যেমন: রাজ কাঁকড়া, হাব্বা কাকড়া, জাহাজি কাকড়া, সাতারো কাঁকড়াসহ প্রায় আশি প্রজাতির সাদা মাছ, পঁয়ষট্টি প্রজাতির (বিপন্ন প্রায়) স্থানীয় ও যাযাবর পাখি এবং কমপক্ষে তিন প্রজাতির ডলফিন বিচরণ করে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের মধ্যে কোরাল, ঝোল, বাটা, তাইলা, দাতিনা, কাউন (কনর মাছ) ও প্যাবাবন সমৃদ্ধ এলাকার অন্যান্য মাছ পাওয়া যায়। সরকারী ভাবে পর্যটনের ব্যবস্থা করলে দ্বীপের অবহেলিত মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং সরকারী খাতে প্রচুর রাজস্ব আয় হবে।

টেকনাফ থানা শহর থেকে প্রায় ৩৫ কি.মি. সমুদ্র গর্ভে মনোরম দ্বীপ সেন্টমার্টিন। প্রায় ৯৬ বর্গ কি.মি. জুড়ে প্রবাল পাথরের মেলা, সমুদ্র তীরে সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ, দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া সমুদ্রের নীল জলরাশি আর এখানকার আদিবাসীদের বিচিত্র জীবনযাপন। দ্বীপে পা দিলেই বুঝতে পারা যায় এটিকে নিয়ে মানুষ কেন এত মাতামাতি করে, আর কেনইবা একে বলা হয় সুন্দরের লীলাভূমি। বাংলাদেশে যতগুলো উল্লেখযোগ্য পর্যটন এলাকা রয়েছে সেন্টমার্টিন তার মাঝে অন্যতম প্রধান ও নান্দনিক। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ কিলোমিটার এবং প্রস্থে কোথাও ৭০০ মিটার আবার কোথাও ২০০ মিটার। সেন্টমার্টিনের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম দিক জুড়ে রয়েছে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার প্রবাল প্রাচীর। দ্বীপের শেষ মাথায় সরু লেজের মত আর একটি অবিচ্ছিন্ন দ্বীপ রয়েছে যার নাম ছেঁড়াদ্বীপ। সেন্টমার্টিনের অধিবাসীরা প্রায় সবাই জেলে। শুটকি তাদের প্রধান ব্যবসা। কিছু কৃষক পরিবার এখানে ধান, ডাল, শাক সবজি উৎপাদন করে। এ ছাড়া পর্যটন শিল্পের সাথে বহু স্থানীয় মানুষ জড়িত রয়েছে। এই দ্বীপের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় চার হাজার। বর্তমানে মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, থানা ফাঁড়িসহ নানান স্থাপনা গড়ে উঠেছে। দ্বীপের সমুদ্র ঘেঁষে একপাশে আছে কচ্ছপের হ্যাচারি।

এটি সত্যিই একটি ভিন্ন প্রকৃতির দ্বীপ। অসংখ্য নারিকেল গাছ, কেয়া গুল্ম আর সবুজ বনানী এই দ্বীপকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। পুরোদ্বীপ ঘুরলে মনে হবে নারিকেল বাগান এটি। সৈকতের অজস্র লাল কাঁকড়া নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট করবে। অবচেতন মনেই যে কেহ কুড়িয়ে নিবে বিভিন্ন রকম নুড়ি পাথর আর ঝিনুক। আর অসংখ্য সীগালের উড়াউড়ি তো আছেই মন মাতাতে। সেন্টমার্টিন দ্বীপ স্থানীয়ভাবে জাজিরা নামে পরিচিত। এক সময় এই দ্বীপটি ছিল একটি বিশ্রামাগারের মত। বিভিন্ন দেশের বণিকরা বিশেষ করে আরব বণিকরা পণ্য নিয়ে যখন সওদা করতে যেতো তখন তারা এই দ্বীপে বিশ্রাম নিত। আর তখন থেকেই এই দ্বীপের নাম হয় জাজিরা। তবে পরবর্তীতে এটি নারিকেল জিনজিরা বলেও

পরিচিতি লাভ করে। অসংখ্য নারিকেল গাছের সমারোহ থাকায় এ দ্বীপকে এই নামে ডাকা হয়ে থাকে। সবশেষে ইংরেজরা এই দ্বীপটির নামকরণ করে সেন্ট মার্টিন এবং দেশ বিদেশের মানুষের কাছে এখন পর্যন্ত এই নামেই পরিচিত। তবে নামকরণ নিয়ে আছে মজার একটি গল্পও। একদা নাকি নারকেল জিজিরায় মার্টিন নামে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এক সাধু বাস করতেন।

একবার ঘূর্নিঝড়ের সময় উঠু উঠু ঢেউ দ্বীপটিকে গ্রাস করে নেবে- ঠিক সেই সময়ই সাধু মার্টিন নাকি তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে বিশাল একটা আকাশ সমান পালের মতন ফুলে উঠে অস্থির অশান্ত ঢেউগুলি আটকে দ্বীপটিকে রক্ষা করেছিলেন। তারপর থেকেই সাধু মার্টিনের নামেই দ্বীপের নাম হল সেন্টমার্টিন।

কক্সবাজার চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৫২ কিঃ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব ৪১৪ কি.মি. ঢাকা থেকে সড়ক পথে বাসযোগে এবং বিমান পথে খুব সহজেই কক্সবাজার যাওয়া যায়। সরকার কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার অবধি রেললাইন স্থাপনের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনেক হোটেল, বাংলাদেশ পর্যটন কেন্দ্র নির্মিত মোটেল ছাড়াও সৈকতের নিকটেই বিশটি পাঁচতারা হোটেল রয়েছে। এছাড়া এখানে পর্যটকদের জন্য গড়ে উঠেছে ঝিনুক মার্কেট। সীমান্ত পথে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে আসা বাহারি জিনিসপত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে বার্মিজ মার্কেট। এখানে রয়েছে দেশের একমাত্র ফিস এ্যাকুরিয়াম। আরো রয়েছে প্যারাসেলিং, ওয়াটার বাইকিং, বিচ বাইকিং, কক্সকার্নিভাল সার্কাস শো, দরিয়ানগর ইকোপার্ক, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত অসংখ্য স্থাপত্য, ফিউচার পার্ক, শিশুপার্ক এবং অসংখ্য ফটোশুট স্পট। এখানে রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ সাফারি পার্ক দি বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক। এখানে আরো আছে টেকনাফ জিওলজিক্যাল পার্ক। এখানে উপভোগের জন্য রয়েছে নাইট বিচ কনসার্ট। সমুদ্র সৈকতকে লাইটিং এর মাধ্যমে আলোকিত করার ফলে এখানে রাতের বেলায় সমুদ্র উপভোগের সুযোগও রয়েছে। এখানে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন নিয়ে নির্মিত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সি-একুইরিয়াম। ক্যাবল কার এবং ডিজনিল্যান্ড।

কক্সবাজারে বিভিন্ন উপজাতি বা নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাস করে যা শহরটিকে করেছে আরো বৈচিত্র্যময়। এসব উপজাতিদের মধ্যে চাকমা সম্প্রদায় প্রধান। কক্সবাজার শহর ও এর অদূরে অবস্থিত রামুতে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থস্থান খ্যাত বৌদ্ধ মন্দির। কক্সবাজার শহরে যে মন্দিরটি রয়েছে তাতে বেশ কিছু দুর্লভ বৌদ্ধ মূর্তি। এই মন্দির ও মূর্তিগুলো পর্যটকদের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয়। কক্সবাজারে শুধু সমুদ্র নয়, আছে বাঁকখালী নামে একটি নদীও। এই নদীটি শহরের মৎস্য শিল্পের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ কক্সবাজার বাংলাদেশের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে বিখ্যাত।

কক্সবাজার শহর থেকে নৈকট্যের কারণে লাবণী পয়েন্টের কক্সবাজারের প্রধান সমুদ্র সৈকত বলে বিবেচনা করা হয়। নানারকম জিনিসের পসরা সাজিয়ে সৈকত সংলগ্ন এলাকায় আছে ছোট বড় অনেক দোকান যা পর্যটকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ। হিমছড়ি কক্সবাজারের ১৮ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। পাহাড় আর ঝর্ণা এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কক্সবাজার থেকে হিমছড়ি যাওয়ার পথে বামদিকে সবুজঘেরা পাহাড় আর ডানদিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি করে। বর্ষার সময়ে হিমছড়ি ঝর্ণাকে অনেক বেশি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বলে মনে হয়। হিমছড়িতে পাহাড়ের চূড়ায় একটি রিসোর্ট আছে যেখান থেকে সাগরের দৃশ্য অপার্থিব মনে হয়। অর্থাৎ এখান থেকে সম্পূর্ণ সমুদ্র এক নজরে দেখা যায়। হিমছড়ির প্রধান আকর্ষণ এখানকার ক্রিসমাস ট্রি। সম্প্রতি হিমছড়িতে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু পর্যটন কেন্দ্র ও পিকনিক স্পট।

দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত ছাড়াও কক্সবাজারে সৈকত সংলগ্ন আরও অনেক দর্শনীয় এলাকা রয়েছে যা পর্যটকদের জন্য প্রধান আকর্ষণের বিষয়। সৈকত সংলগ্ন আকর্ষণীয় এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইনানী সমুদ্র সৈকত যা কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় ৩৫ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। অত্যাবশ্যক সৌন্দর্যে ভরপুর এই সমুদ্র সৈকতটি কক্সবাজার থেকে সড়ক পথে মাত্র আধ ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত। পরিষ্কার পানির জন্য জায়গাটি পর্যটকদের কাছে সমুদ্রস্নানের জন্য উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত।

পর্যটন নগরী কক্সবাজার বাংলাদেশের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র যেখানে দীর্ঘতম একক সমুদ্র সৈকতসহ বেশ কয়েকটি নৈসর্গিক ছোট ছোট দ্বীপ, পাহাড়, বনাঞ্চল প্রভৃতি রয়েছে। তাছাড়াও শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণের বিশাল সুযোগ রয়েছে এ জেলায়। এ বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে কক্সবাজারকে আন্তর্জাতিকমান সম্পন্ন পর্যটন নগরীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক আধুনিক মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা সমীচিন হবে। বিশ্বের পর্যটন সমৃদ্ধ নগরী হিসাবে গড়ে তুলতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় এই জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

সংগৃহিত